শাবলতলার মাঠ

(গল্পগ্রন্থ – উপলখণ্ড)

অনেক দিন পরে শাবলতলার মাঠ দেখলাম সেদিন। আমার পিসিমার বাড়ির দেশে। ছেলেবেলায় যখন পিসিমার বাড়ি থেকে দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালায় পড়তাম সে আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা। পিসিমা মারা যাওয়াতে সে গ্রামে আর যাই নি কখনও।

সেদিন আবার কার্যোপলক্ষে গরুর গাড়ি চড়ে যেতে যেতে শাবলতলার মাঠ চোখে পড়ল, কিন্তু মস্ত বড় কি এক কারখানা হচ্ছে সেখানে। রেল লাইন বসেছে মাঠের ওপর দিয়ে—বড় রেল লাইন। কত যে লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে! লোকজন কুলিমজুরের ভিড়, দুমদাম শব্দ, সে কি বিরাট ব্যাপার।

চালাঘর ও তাঁবু চারিধারে। ইন্‌জিনিয়ার-ওভারসিয়ারের দল খেটে খেটে সারা হলো। পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টরের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারের খুঁটি বসানো হচ্ছে, ইলেকট্রিকের ও টেলিফোনের তার খাটানো হবে। ইটবোঝাই কাঠ-বোঝাই লরির ভিড় নতুন তৈরি চওড়া রাস্তাগুলোর ওপরে। চুনের ধুলো, সিমেন্টের ধুলো উড়ছে বাতাসে।

এ কি হলো?

আমার সেই ছেলেবেলাকার শাবলতলার মাঠ কোথায় গেল? সত্যিই তা নেই। তার বদলে আছে কতকগুলো তাঁবুর সারি, ইটখোলা, পাথুরে কয়লার স্তূপ, চুনের ঢিবি, কাঠের ঢিবি, লোকজনের হৈ চৈ, লরির ভিড়।

আজ সকালে মার্টিন লাইনের ছোট স্টেশনে নেমেছি, গরুরগাড়ি করে চলেছি পিসিমার বাড়ির গ্রামের পাশের একটা গ্রামে মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতে। রাস্তার ধারে পড়ে শাবলতলার মাঠ। হঠাৎ দেখি এই অবস্থা তার।

গরুরগাড়ির গাড়োয়ানকে বলি—হ্যাঁরে, এটা শাবলতলার মাঠ, না?

—হ্যাঁ বাবু।

—কি হচ্ছে এখানে?

—কি জানি বাবু, কলকারখানা বসছে বোধ হয়।

—কতদূর নিয়ে?

—তা বাবু অনেক দূর নিয়ে—উই বাজিতপুর, মনসাতলা, ছাওয়াল-মারি, বেদে-পোতা, হাঁসখালির চড়া পর্যন্ত।

—গ্রামগুলো সব কোথায়?

—সব উঠিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ল আমার এগার বছর বয়সের একটি মধ্যাহ্নদিন। আর মনে পড়ল দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের উমাচরণ মাস্টারকে।

উমাচরণ মাস্টার কতদিন থেকে দুর্গাপুর ইউ পি পাঠশালার হেডমাস্টারি করছিলেন তা আমি বলতে পারব না। গ্রামের রায় জমিদারদের ভাঙা কার্নিসে পায়রার বাসাওলা বৈঠকখানার একপাশে সেকেলে তক্তপোশে ছিল তাঁর বাসা। দেওয়ালে তাঁর হুঁকো ঝুলত পেরেকের গায়ে, বাঁশের আলনায় তাঁর দুখানা আধময়লা ধুতি ও এক এবং অদ্বিতীয় পিরানটি আলতো করে ঝোলানো থাকত—আর থাকত তক্তপোশের নীচে একজোড়া কাঠের খড়ম। একটা টিনের বিবর্ণ তোরঙ্গ। একটা চটের-থলে-ভর্তি টুকিটাকি জিনিস। একখানা পাকা বাঁশের লাঠি এবং—সেইটেই বেশি করে মনে আছে—একগাছা তেলে-জলে পাকানো বেত।

উমাচরণ মাস্টার আবার বই লিখতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক, লেখক বা সাহিত্যিকের যশোগৌরব সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন খুবই অস্পষ্ট—তবুও মাস্টারমশায় যখন ক্লাসের টেবিলের ওপর পা তুলে গম্ভীরভাবে তাঁর লেখা 'আক্কেল গুড়ুম' বই পড়তেন—তখন আমরা ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বিস্ময় ও প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘগুম্ফযুক্ত বসন্তের দাগ-আঁকা প্রৌঢ় মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে থাকতাম।

হ্যাঁ—তাঁর বই-এর নাম ছিল'আক্কেল গুড়ুম'—তিনি বলতেন 'প্রহসন'। আমার যা বয়স তখন তাতে 'আক্কেল গুড়ুম' বা 'প্রহসন' দুটো কথার একটারও মানে বুঝতাম না। মনে আছে বই-এর মধ্যে একটি ইংরেজি-পড়া ছোকরার কথা আছে এবং পড়ার ভঙ্গিতে মনে হত উক্ত ইংরেজি-পড়া ছোকরা খুব ভাল লোক নয়।

উমাচরণ মাস্টার আমাদের দিকে চেয়ে সগর্বে বলতেন—এই বই পড়ে গোবরডাঙার সেজবাবুর শালা কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, উমাচরণবাবু, আপনি কালে গিরিশ ঘোষের সমান লেখক হবেন।—বুঝলে?

আমি বলেছিলাম—গিরিশ ঘোষ কে পণ্ডিত মশাই?

উমাচরণবাবু অনুকম্পার হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন—গিরিশ ঘোষ? জান না?হুঃ কি-বা জান?

আমি লজ্জায় চুপ করে থাকি। কি উত্তর দেব? যখন সত্যই জানি নে গিরিশ ঘোষ কে, নামও কোনোদিন শুনিনি! উমাচরণ তাঁর এই মূল্যবান প্রহসন আমাদের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করতেন এবং বিক্রি অনেক করেছিলেনও। প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ি একখানা বা দুখানা করে 'আক্কেল গুড়ুম' ছিলই। মাইনের টাকা দিলে খুচরো ফেরত দেওয়ার রীতি ছিল না তাঁর। বলতেন—কত বাকি? সাত আনা?নাও একখানা ভাল বই নিয়ে যাও। বাড়ি গিয়ে পড়তে দিয়ো সবাইকে।

একদিন পিসিমা বললেন—হ্যাঁরে, মাইনের টাকা দিলাম, ন আনা পয়সা ফেরত দিলি নে?

—না পিসিমা। মাস্টার মশাই বই একখানা দিয়েছেন তার বদলে।

—কি বই?

—আক্কেল গুড়ুম।

—ওমা, সে আবার কি বই? তুই কি বলে সেই বই আনতেগেলি? যেমন পোড়ারমুখো মাস্টার তেমনই পোড়ারমুখো ছেলে! বই-এর নাম শোন না—'আক্কেল গুড়ুম'। কেষ্টর শতনাম পাওয়া যায় তো একখানা আন্ গে বরং—ও বই ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

—সে হবে না পিসিমা, তিনি ওসব বাজে বই লেখেন না। এ হলো প্রহসন।

—সে আবার কি রে?

—সে তুমি বুঝবে না? গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছ?

—সে কে আবার? আমাদের গাঁয়ে তো ও নামের কেউ নেই। দুগ্‌গগাপুরের লোক নাকি?

—সে তুমি বুঝবে না। তিনি আমাদের মাস্টার মশায়ের মত প্রহসন বই লেখেন।

পিসিমা ধমক দিয়ে বলতেন—তুই চুপ কর বাপু—বড় পণ্ডিত হয়েছিস তুই! আমি জানি নে—ওঁর গাল টিপলে দুধ বেরোয় উনি জানেন—ফাজিল কোথাকার! ওসব গিরিশ ঘোষ সতীশ ঘোষ বুঝি নে—কাল ও বই ফেরত দিয়ে কেষ্টর শতনাম আনতেপারিস ভাল, নয়তো ন আনা ফেরত আনবি—যা—

একদিন উমাচরণ মাস্টার মশায় আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, বড় বড় লেখকরা সবাই প্রথম জীবনে তাঁর মত ইস্কুল-মাস্টারি করেছিলেন। কথাবার্তার মাঝখানে আমাদের ক্লাসের সারদা হঠাৎ বলে বসল—আপনার বয়স কত মাস্টার মশাই?

—কেন রে?

—তাই বলছি।

উমাচরণ মাস্টার তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম ছেলেটার খটকা বাধছে কোথায়। এই বয়সেও যদি এখন উমাচরণ মাস্টার আমাদের এই স্কুলে মাস্টারি করতে রয়ে গেলেন,

তবে কোন্ বয়সে গিয়ে তিনি কোথায় কি বড় কাজ করবেন? আমাদের ক্লাসের সতু কিন্তু বলত—মাস্টার মশাই খুব বড় পণ্ডিত। ওরকম হয় না।

আমি বললাম—কেন রে?

—উনি চালতেবাগানের মাঠের ধারে বসে রোজ কি করেন! বোধ হয় লেখেন। কবিমানুষ কিনা।

আমি একদিন সতুর সঙ্গে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। চালতেবাগান বহুকালের প্রাচীন আম তেঁতুল গাছের ছায়ায় দিনমানেই সন্ধ্যার মত অন্ধকার। অনেক রকম মোটা লতা গাছে গাছে জড়াজড়ি করে আছে। বাগান পার হয়েই একটা ছোট মাঠ, উমাচরণ মাস্টার সে মাঠের ধারে বসে আছেন, বাগানের ছায়ার আশ্রয়ে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে। মাদুরের ওপর কাগজ বই ছড়ানো। পাছে উড়ে যায় বলে মাটির ছোট ছোট ঢেলা চাপানো সেগুলোর ওপর। আমরা শ্যাওড়া ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতেলাগলাম, তিনি কখনও উপুড় হয়ে কি লিখছেন, কখনও সামনের মাঠের দিকে চেয়ে কি ভাবছেন, কখনও আপনমনে হাসছেন, বিড় বিড় করে কি বকছেন।

সতু সসম্ভ্রমে চুপি চুপি বললে—দেখলি? কবিমানুষ!

আমি বললাম—কি করছেন?

—লিখছেন।

—বিড় বিড় করে কি বকছেন?

—ও রকম কবিরা করে থাকে।

দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে কবির কাণ্ড অনেকক্ষণ দেখলাম। এই আমার জীবনে প্রথম একজন জীবন্ত কবির ক্রিয়াকলাপ দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটল। মনে আছে, শ্যাওড়া ঝোপের পাশেই ছিল বড় একটা কতবেল গাছ, তলা বিছিয়ে পড়ে ছিল পাকা পাকা কতবেল। সেই বয়সের লোভ, বিশেষ করে কতবেলের ওপর লোভ দমন করেছিলাম। কবি দেখবার আনন্দে ও বিস্ময়ে। উমাচরণ মাস্টারের বয়স তখন কত?আমার মনে হয় চল্লিশের ওপর। কারণ আমার মায়ের বড় ভাই, আমার বড় মামা—যাঁর বয়স তখন শুনতাম পঁয়ত্রিশ—তিনি মাস্টার মশায়কে 'দাদা' বলে ডাকতেন।

আমরা যেমন নিঃশব্দে সেখানে গিয়েছিলাম তেমনই নিঃশব্দে চলে এলাম মনে বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে।

এর পরে উমাচরণ মাস্টার যখন পড়াতেন, তখন হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতাম। একজন কবি বটে! উনি ঠিকই বলেছেন—বড় বড় লোকেরা প্রথম জীবনে মাস্টারি করে। ওঁর বয়স বেশি হয়েছে বটে কিন্তু উনি একজন কবিও তো হয়েছেন। সারদাটা কিছুই বোঝে না।

বছরখানেক কাটল। আমরা কটি ছেলে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হয়েছি। সেই বছর উমাচরণ মাস্টার আমাদের নিয়ে রানাঘাটে যাবেন পরীক্ষা দেওয়াতে। চারটি ছেলে—মনে আছে চক্কত্তিদের কানাই, আমি, সতু ও সারদা। দুর্গাপুর থেকে হেঁটে বেরিয়ে শাবলতলার মাঠে যখন পড়েছি, তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

বড্ড মনে আছে সেই অপরাহ্নের কথাটি। তখন শাবলতলার মাঠে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মস্ত বড় মাঠের এখানে ওখানে কুলগাছ শ্যাওড়া-ডাঁটা আর বনতুলসীর জঙ্গল। ধু ধু করছে মাঠ যেন সমুদ্রের মত, কূলকিনারা নেই কোনো দিকে। এত বড় মাঠ কখনও দেখি নি। দুর্গাপুর থেকে শাবলতলার মাঠ প্রায় দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ পথ। কাছাকাছি কোনো গ্রাম নেই এ মাঠের কোনো দিকে। একটা সরু মেঠো পথ মাঠের মধ্যে দিয়ে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। কি একটা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে দুপুরের রোদে। আমরা সবাই ছেলেমানুষ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। উমাচরণ মাস্টার বললেন—যাও সব গাছতলায় একটু বসে নাও।

আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বোঁচকা। তার মধ্যে আমাদের বই-দপ্তরআছে, কাপড় গামছা ও কাঁথা আছে। থাকতে হবে নাকি হোটেলে। আমরা বোঁচকা নামিয়ে একটা কুলগাছের তলায় সবাই বসলাম। মাস্টার মশায় বললেন—দেখ তো কুল হয়েছে কিনা।

সতু দেখে বললে—কুল হয়েছে, ছোট ছোট—খাওয়া যায় না।

কানাই-এর মা ওকে সেখানে গিয়ে খাবার জন্যে নারকোলের নাড়ু আর রুটি করে দিয়েছিলেন পুঁটুলিতে। সতু ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেলে। আমি চাইতে গেলাম, কানাই বললে, নেই।

আমরা একটু পরে সবাই বোঁচকা রেখে হুটোপাটি করে মাঠের মধ্যে বনতুলসীর জঙ্গলে খেলা করতে লাগলাম। কি সুন্দর যে লাগছিল। ক্ষুদ্র গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় খেলা করে বেড়াই, এত বড় মাঠের এত ফাঁকা জায়গায় খেলা করবার সুযোগ কখনও পাইনি। ওদের কেমন লাগছিল জানি না, আমার মনে হচ্ছিল যেন কোনো নতুন রাজ্যে রূপকথার জগতে এসে পড়েছি—তুলসীমঞ্জরীর সুগন্ধভরা অপরাহ্ণের বাতাসে যেন কোন্ সুদূরের ইঙ্গিত। যে দেশ কখনও দেখিনি, যার কথা কিন্তু আমার মনে সর্বদাই উঁকি দেয়, আজ এই শাবলতলার মাঠে এসে সেই দূর-দূরান্তরকে দেখতে পেলাম। ঝোপে ঝোপে শালিক আর ছাতারে পাখির কলরব, এখানে ওখানে বেলে জমিতে খেঁকশেয়ালের গর্ত, রাঙা কেলেকোঁড়া ফুলের লতা জড়িয়ে উঠেছে বুনো কলুচটকা আর তিত্তিরাজ গাছে, জনমানুষের বাস নেই, এটা কলা গাছ কি আম গাছ চোখে পড়ে না, যেন এ জগতে মানুষের বাস নেই, শুধুই বনঝোপের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করে পাতার ধুলো উড়িয়ে এ দেশে চলে যাও, লেখাপড়ার বিরক্তিকর বাধ্যতা এখানে নেই। খেলা ছেড়ে লেখাপড়া করতে কেউ বলবে না এ দেশে। উমাচরণ মাস্টার সেই পুরনো, একঘেয়ে, বালকের পক্ষে মহা বিরক্তিকর জগতের মানুষ, এ নতুন জীবনের উদাস মুক্তির মধ্যে, দিনরাতব্যাপী খেলা আর অবকাশের মধ্যে ওঁর স্থান নেই আদৌ।

বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ সতু বললে—হ্যাঁরে, মাস্টার মশাই কোথায় রে?

আমি বললাম—কেন, কুলতলায় নেই?

—কতক্ষণ তো তাকে দেখছি নে। গেলেন কোথায়? আমাদের যেতে হবে না ইস্টিশনে?দু ঘণ্টার ওপর তো এখানে আছি। গাড়ি ধরতে হবে না?

আমার মনে হচ্ছিল গাড়ি ধরে আর কি রাজা হব আমরা! এই তো বেশ আছি, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যে না-ই বা গেলাম। ইন্‌স্‌পেক্টর এসে সেবার স্কুলে বলে গিয়েছিল রানাঘাট গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ায় নাকি নানা গোলমাল। খাতায় লিখে পরীক্ষা হয়, গার্ড আছে সেখানে ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে, একটু যে দেখাদেখি করবে কি বলাবলি করবে তার কোনো উপায় নেই। বলাবলি করলেই মহকুমার হাকিমের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে, তিনি জেলও দিতে পারেন, জরিমানাও করতে পারেন। একটু ফিসফাস করবার জো নেই সেখানে। নবমীর পাঁটার মত কাঁপতে কাঁপতেঢুকতে হবে হলঘরে। কি ভীষণ পরিণাম ছাত্রজীবনের!

সত্যি বলছি, শাবলতলার মাঠ দেখবার পরে, এখানে এসে এই দু ঘণ্টা ছুটোছুটি করে বেড়ানোর পরে আমি যেন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। তা হচ্ছে এই রকম বিশাল মুক্ত বনময় ধূলিভরা মাঠের অবাধ শান্তি আর স্বাধীনতার মধ্যে খেলা করে বেড়ানো। পরীক্ষা দিয়ে কি হবে! কানাই এসেও বললে—আমরা যাব কখন? মাস্টার মশাই কোথায়?

সত্যিই তো, তাঁকে কোনো দিকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই মিলে খুঁজতে বার হওয়া গেল। সতু ডাকতে লাগল—ও মাস্টার মশাই, মাস্টার ম-শা-ই—

কোনো সাড়া নেই।

সতু ভীতমুখে বললে—বাঘে নিয়ে গেল নাকি রে?

কানাই বললে—দূর, এখানে মানুষ-খেকো বাঘ থাকবে?

—না, নেই! তোকে বলেছে!

—তবে গেলেন কোথায়?

আমি বললাম—তোমরা খুঁজে দেখ। আমি এখানে খেলা করি।

এমন সময় সারদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—শীগগির—শীগগির আয়—দেখে যা—

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম—কি হয়েছে রে? বেঁচে আছেন তো?

কথা বলতে বলতেই আমরা সারদার পেছনে ছুটলাম। বেশ খানিকটা দূর দৌড়ে সারদা থেমে পড়ল এবং আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে আমাদের চুপ করতে বলে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

একটা শুকনো খাল-মত নীচু জায়গায় কুঁচঝোপের আড়ালে উমাচরণ মাস্টার বসে বসে ঝুঁকে পড়ে কি লিখছেন সেই আর-একদিনের মত। জায়গাটাতে খুব ছায়া পড়েছে। কুঁচঝোপটায় পাখিরা কিচির কিচির করছে—সামনে অনেকদূর ফাঁকা। সুন্দর জায়গাটি। এই মাঠের মধ্যে এই জায়গাটাই সব চেয়ে ভাল। কবি উমাচরণ মাস্টার ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে বিড় বিড় করে আপনমনে কি বলছেন, এমন কি আপনমনে ফিক ফিক করে হাসছেনও। যে কেউ দেখলে বলবে উন্মাদ পাগল। অমন তন্ময় হয়ে লিখতে আমরা তাঁকে কখনও দেখিনি, অমন ভাবে আপনমনে হাসতেও তাঁকে কখনও দেখিনি।

সতু মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বললে—মাস্টার মশাই একজন আসল কবি।

সারদা ওর মতে মত দিয়ে বললে—ঠিক তাই।

কানাই ও আমি কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে এই সত্যিকার জীবন্ত কবিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের কত ভাগ্যি যে আমরা এমন মাস্টার পেয়েছি।

কানাই একটু পরে বললে—কিন্তু ভাই, সন্ধ্যে হলো। ওঁকে না ডাকলে আমাদের উপায় কি হবে? ডাকি ওঁকে! কি বলিস?

কেউ সাহস করে না।

সারদার মনে কবির প্রতি শ্রদ্ধা একটু ফিকে, সে দু-একবার আমাদের উপস্থিতি-জ্ঞাপক কাশির আওয়াজ করলে।

সতু চুপি চুপি বললে—এই! আস্তে!

সারদা বললে—হ্যাঁ, আস্তে বই কি! আমরা মরি এখন এই মাঠের মধ্যে সন্ধ্যেবেলা! বাঘে ধরুক সবসুদ্ধ—বলে সজোরে একবার কাশির আওয়াজ করতেই উমাচরণ মাস্টার চমকে পেছন ফিরে চাইলেন।

সারদা বললে—আসুন মাস্টার মশাই, সন্ধ্যের দেরি নেই যে—ইস্টিশান এখনও অনেকখানি রাস্তা—

উমাচরণ মাস্টার ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র গুটিয়ে বগলে করে নিয়ে আমাদের কাছে উঠে এলেন শুকনো খাল থেকে। অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন—তাই তো, বেলা গিয়েছে দেখছি। চল চল!

তারপর পেছনদিকে চেয়ে বললেন—জায়গাটা বড় চমৎকার—না?

সতু সশ্রদ্ধ সুরে বললে—ওখানে কি করছিলেন মাস্টার মশাই? কি আছেওখানে?

উমাচরণ মাস্টার ধমক দিয়ে বললেন—সে কি তুই বুঝবি? সিনারি কাকে বলে জানিস? চমৎকার সিনারি ওখানটাতে। কবিতা লিখছিলাম। কি চমৎকার মাঠটা, বুঝিস কিছু?

আমারও চোখে যে এই অপরাহ্ণে এই মাঠ অদ্ভুত ভাল লেগেছে, মাস্টার মশায়ের কথার মধ্যে তার সায় পেয়ে আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। আমি নতুন দৃষ্টি পেলাম সেই দিনটিতে, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে যাবার পথে। উমাচরণ মাস্টার কত বড় শিক্ষকের কাজ করলেন সেদিন—তিনি নিজেও কি তা বুঝলেন?

আমার কথা এখানেই শেষ। উমাচরণ মাস্টারের ইতিহাসও এখানেই শেষ। প্রায়ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা সেসব। উমাচরণ মাস্টার আজ আর বোধ হয় বেঁচে নেই। বড় হয়ে উমাচরণ চক্রবর্তী বলে কোনো কবির লেখা কোথাও পড়িনি বা কারও মুখে নামও শুনি নি। তাতে কিছু আসে যায় না। যশোভাগ্য সকলের কি থাকে!

আজ এতকাল পরে শাবলতলার মাঠে এসে আবার মনে পড়ে গেল বাল্যের সেই অপূর্ব অপরাহ্ণের কথা, মনে পড়ে গেল উমাচরণ মাস্টারকে। দুঃখ হলো দেখে—সে শাবলতলার মাঠ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মুছে গিয়েছে সে সৌন্দর্য, সে নির্জনতা। উমাচরণ মাস্টারের জন্যে মনটা এতদিন পরে যেন কেমন করে উঠল।